কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28-NOV-2013 ...
পৃঃ ১৮ ... কঃ ২ ...

স্কুল ফিডিং : শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টি

লিমন বাসার, বগুড়া ▶

বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে ধুনট উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম উলিপুর। এই গ্রামের বিদ্যালয়ের নাম উলিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, শিশুদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রধান শিক্ষক আতিকুল হক খোকন জানান, অভিভাবকরা দরিদ্র হওয়ায় সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। শিশুরা বাড়ি অথবা মাঠের কাজে পরিবারকে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে আসা শিশুদের বেশির ভাগই সকালে না খেয়ে আসে। এলাকার বেশির ভাগ পরিবারই শিশুদের তিন বেলা নিয়মিত খাবার দিতে পারে না। ফলে শিশুরাও স্কুলমুখো হতে চায় না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এসব শিশুর অনেকেই পরিবারকে সহযোগিতা করতে কাজ করছে। তদুপরি স্বাস্থ্যের রোগবালাই। নিয়মিত খাবার না খাওয়ায় অপুষ্টিতেও ভোগে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৬০ শতাংশ। ওই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ইসরাত জাহান জানায়, সে সকালে কিছু না খেয়েই স্কুলে এসেছে। এখন দুই পিরিয়ড করেই বাড়ি ফিরে যাবে। কারণ স্কুল ছুটির সময় বিকেল ৪টা। তখন পর্যন্ত না খেয়ে সে থাকতে পারবে না।

উলিপুরের ওই বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার দূরে সোমনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নওগাঁর পোরশা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে দুর্গম গ্রাম সোমনপুর। সেই গ্রামের বিদ্যালয় এটি। ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, শিশুদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি। সহকারী শিক্ষকরা জানান, আগে অর্ধেকের বেশি শিশু স্কুলে ঠিকমতো আসত না। আবার এলেও দুপুরের পর থাকত না। এখন নিয়মিত আসে।

প্রধান শিক্ষক আজাহার আলী মোল্লা জানান, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার পাল্টে গেছে। এখন প্রতিদিন ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়। ওই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শ্যামলী বলে, 'হামরা গরিব। অন্য মানষের জাগাত থাকি। হামার বাপ মানষের জমিত কাম করে। আগে সকালে না খায়ে স্কুলে যাতাম। তাই সারা দিন স্কুলে থাকতে পারতো (পারতাম) না। হামি একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেছোনো। তাই স্কুলে আসতো না। এখন স্কুলে বেস্কুট দেয়। তাই আর ভোগ (ক্ষিধা) লাগে না। সারা দিন স্কুলে পড়ি। স্কুল পালি (মিস) করি না। শরীলে আগের থেকে জোর পাই।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঝরে পড়া রোধ, উপস্থিতি শতভাগে উন্নীত এবং শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে ২০১০ সালে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে সরকারি অর্থায়নে ৪২টি উপজেলার প্রায় ১৮ লাখ এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে ৩০টি উপজেলার প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট বিস্কুট দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুষ্টিকর এ বিস্কুট খাওয়ার ফলে পোরশা উপজেলায় শিশুদের (৬ থেকে ১২ বছর) রোগবালাইতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে। আগে প্রতিদিন গড়ে ১০টি শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবা নিত। এ অবস্থা এখন পাল্টে গেছে। পোরশা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মতিউর রহমান জানান, নিয়মিত পুষ্টি বিস্কুট খাওয়া বাচ্চাদের কেউ আর রোগে ভুগছে না। পোরশা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল জাব্বার জানান, কর্মসূচির আওতাভুক্ত এলাকায় শিক্ষার্থী ভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। উপস্থিতির হারও বেড়েছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পোরশা উপজেলার একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা জানান, এই কর্মসূচি চালু হওয়ার পর ঝরে পড়া শিশুর হার কমেছে। আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনতে হতো। এখন সেটিও করতে হয় না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুষ্টি বিস্কুটে আছে গমের ময়দা ৬৯ শতাংশ, চিনি ১২ শতাংশ, উদ্ভিদ বা ভেজিটেবল ফ্যাট ১৩ শতাংশ, সয়া ময়দা ৬ শতাংশ। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় আয়োডিনযুক্ত লবণ, জিঙ্ক, লৌহ, বেকিং সোডা এবং ১৪ ধরনের ভিটামিন আছে, যা তাদের শরীরের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা শতভাগ পূরণ করে।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. ইফতেখারুল ইসলাম বাপ্পী জানান, ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী একটি শিশুর শরীরে প্রতিদিন এক হাজার ৪০০ থেকে এক হাজার ৫০০ ক্যালরির খাবার প্রয়োজন। প্রতিদিন এই চাহিদা পূরণ হলে ওই শিশু পুষ্টির অভাবজনিত কোনো রোগে ভুগবে না। তার শরীর ও মেধার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে। পোরশায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের মাঠ কর্মকর্তা আবু তাহের জানান, এ বিস্কুট শিশুর শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৭৫ শতাংশ পূরণ করে।

সরেজমিন
বগুড়া